কথা শেষ

"বাঁকুড়ার বাংলা প্রবাদ : সমাজ ও ভাষার প্রেক্ষিতে" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি করে আমি যতটা আনন্দ পেয়েছি ততটাই জন্মভূমি বাঁকুড়ার সমাজ ও ভাষাকে জানতে পেরে আমি গর্বিত হয়েছি। সর্বপরি জন্মভূমির প্রতি যে আত্মিক সম্পর্ক তা উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছি। গবেষণা কর্মটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে বাঁকুড়ার সমাজ ও ভাষার চিত্রটি সুস্পষ্টভাবে পরিবেশিত হয়েছে, যার পরিচিতি সবার নিকট পৌঁছে যাবে। বিশেষ করে একটি নতুন দিক উদ্‌ঘাটন করতে পেরে আনন্দিত হয়েছি যে বিশিষ্ট জনের উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, ব্যতিত বাঁকুড়ার নিজস্ব প্রবাদ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাঁকুড়ার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক, রাজনৈতিক, ইতিহাসের বিবর্তনের ধারাটিকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রবাদ বাক্যের মধ্য দিয়ে বাঁকুড়া জেলার প্রান্ত অঞ্চলের মানুষগুলির আঁতের কথা বেরিয়ে এসেছে। তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত প্রবাদের মধ্য দিয়ে মানুষগুলির বেঁচে থাকার সংগ্রামী চেতনা ফুটে উঠেছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত, অত্যাচারে পীড়িত, শাসন ব্যবস্থায় নিগৃহীত প্রান্তিক মানুষগুলি যেমন প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে তেমনি অতীতের পূজা-পার্বণ-উৎসব ইত্যাদি সাংস্কৃতিক দিকগুলির স্মৃতিচারণায় মানসিক তৃপ্তি পেয়েছে। সমাজ ব্যবস্থা, বাহ্যিক রূপ, কথা-বার্তা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিধান, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদিতে তারা স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। নিজস্ব প্রবাদগুলি বাঁকুড়া শহরকে এবং বাঁকুড়াবাসী হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

বাঁকুড়া জেলার নামকরণের পৃথক্ পৃথক্ ব্যাখ্যা, বাঁকুড়া জেলার পরিচিতি, পরিসংখ্যানগত তথ্য, ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিকশ্রুতি ও দৃষ্টি গ্রাহ্য উপকরণ (অডিও, ভিডিও রেকর্ডিং) সংযুক্ত করেছি যা পাঠক, গবেষক অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে উৎসাহিত করতে সাহায্য করবে। বাঁকুড়া জেলায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বাচক সংখ্যা, নারী-পুরুষ সংখ্যা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সংখ্যা, জীবিকা সম্পর্কিত নানান আলোচনা সংক্রান্ত তথ্যগুলি সংগ্রহের জন্য বাঁকুড়ার বিডিও অফিসের সাথে যোগাযোগে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছি। প্রবাদগুলি বিভিন্ন ব্লকের বিভিন্ন নামে পরিচিত কোথাও 'ডাইলগ' (সোনামুখী), কোথাও 'শুলুক' (কেঞ্জাকুড়া, পাহাড়পুর) কোথাও 'টোনকাটা' (রানিবাঁধ) কোথাও 'দহড়া' (মেজিয়া)। বিশেষ করে ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত প্রবাদগুলি সংগ্রহের সময় নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে — যোগাযোগ বিহীন গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে সরু কাঁকুরে লাল মাটির রাস্তার পথই

একমাত্র ভরসা, কখনোও বা নিজস্ব গাড়ির উপর নির্ভর করেছি। বিশেষ করে সংকীর্ণ দুগর্ম জঙ্গল পেরিয়ে 'খাটুল' গ্রামের সন্ধান পেয়েছি। সেখানকার বসবাসকারী মানুষদের গ্রাম্য জীবনাচরণ শহরের জীবনযাত্রা থেকে শতহাত দূরে। তাছাড়া মন্ডলকুলী, বাক্‌তোড়, মধুবনী, ডিহর, পাহাড়পুর গ্রামগুলিতে আজও কংকীট সভ্যতার ছাপ পড়েনি। লক্ষ্য করা গেছে ব্লকের শহরকেন্দ্রিক অঞ্চলগুলির জীবনচর্চা ও গ্রামের প্রান্ত অঞ্চলগুলির জীবনচর্চা সম্পূর্ণ পৃথক। প্রান্তিক মানুষগুলির কথা-বার্তা, আদব-কায়দা, বাসস্থান, খাদ্যাভ্যাস, বিশ্বাস-সংস্কারের সাথে পরিচিত হয়ে বাঁকুড়া জেলার অন্তঃসম্পর্কটিকে নতুন ভাবে জানতে পেরেছি। গ্রামগুলিকে ছেড়ে (যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, বিকেল ৪টের সময়) ঘরে ফেরার মুখে কোথায় যেন অতল স্পর্শে হারিয়ে যায়। সেখানকার আবহাওয়া বা জলবায়ু, সবুজ গাছপালা, মৃত্তিকা, দরদপূর্ণ মানুষগুলির সম্পর্কে এক অনির্বচনীয় বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি। অনাড়ম্বর সহজ-সরল মানুষগুলির দরদ, মমত্ব, আন্তরিকতার টানে অজানা অদৃশ্য শক্তি তাদের কাছে বারবার নিয়ে গেছে। কিছু সময়ের পরিচয়ে মানুষগুলি নিকট আত্মীয় হয়ে উঠেছিলাম – 'ফুল পাতানো', কন্যা সন্তানহীনার কন্যাতে পরিণত হয়েছি, দিদিমা-নাতনির সম্পর্ক, ক্ষুধা নিবৃত হয়েছে দুপুরে ভাত-চচ্চড়ি খেয়ে, চড়া রোদে সাইকেলের পিছনে বসিয়ে (১০-১২ কিলোমিটার) বাস ধরিয়ে দেওয়ার তাগিদ সম্পন্ন, মানুষগুলিকে মনের অন্তঃস্থল থেকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিয়েছি। সেই সব মুহূর্তগুলি নিরবতার সাথে হৃদয়ের ফল্গু ধারায় প্রবাহিত হবে আমার আমৃত্যু পর্যন্ত। বস্তুতঃ ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্ভর কাজ শ্রম সাধ্য ও সময় সাপেক্ষ হলেও নিরীহ-খেটে খাওয়া মানুষগুলির মুখমণ্ডল চোখবন্ধ করে স্মরণ করলে আমার গবেষণা কর্মের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে হয়। এ বিষয়ে আবেগ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে আমার গবেষণা কর্মটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে আমার প্রেরণা শক্তি মা-বাবা।

লুপ্তপ্রায় প্রবাদগুলি সংগ্রহ করতে শুধুমাত্র শ্রম সাধ্য নয়, গবেষণা কর্মের অন্তরায় হয়ে উঠেছিল অপর বেশ কয়েকটি কারণ — ভাষার জড়তা, দ্রুততা, সর্বপরি মানুষগুলির লাজুকতা, বোধগম্যের জন্য একের অধিকবার জিজ্ঞাসা করার প্রয়াস মানুষগুলির অজান্তে অডিও, ভিডিও রেকর্ডিং করা। অক্লান্ত পরিশ্রম যেমন আঞ্চলিক বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে তেমনি গবেষণা কর্মটি সফলতার শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। বাক্যগুলিতে অজস্য ঁ, ই, যফলা প্রয়োগ। এছাড়া ব্যকরণের নিয়ম বিরুদ্ধ ব্যঞ্জনধ্বনি গুলিকে ভেঙে সহজ সরল করে উচ্চারণে এক বিচিত্র ভাষার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। বস্তুতঃ শেষ সিদ্ধান্তে এসে উপলব্ধি করেছি, পুরোপুরি রাঢ়ী উপভাষা নয় বা

পুরোপুরি ঝাড়খণ্ডী উপভাষা নয় - যা একমাত্র বাঁকুড়ার ভাষা; বাঁকুড়ার আঞ্চলিক ভাষাকে চিহ্নিত করে।

পরিশেষে বলা যায় লোকসাহিত্য মানব সমাজের একটি অমূল্য সম্পদ যার অবদান অনস্বীকার্য । একটি জাতির ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতিকে পুষ্ট করে লোকসাহিত্যের উপাদান। এক্ষেত্রে বাঁকুড়ার ভাষা ও সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। বর্তমানে কংক্রীট সভ্যতা ও পাশ্চত্য সংস্কৃতির প্রভাবে লোকসাহিত্যের উপাদানগুলিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য রূপে অবহেলা করছে। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বাঁকুড়ার প্রাচীন ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে দীর্ঘ দিন ধরে রাখা সম্ভব নয়। তাই লোকসাহিত্য চর্চায় অনুসন্ধিৎসু সংগ্রাহকদের এগিয়ে আসতে হবে, উৎসুক গবেষকদের এগিয়ে আসতে হবে, আর কৌতুহলী পাঠকবর্গ যারা রসাস্বাদন করেছেন তাঁদের উৎসাহী মন নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই কুড়িয়ে পাওয়া লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ হবে এবং প্রবাদ বিশ্লেষণ করা সহজ হবে। ভাষা-দেশ-কাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা হবে, সেখানকার সমাজ, ধর্মনৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিক গুলি উৎসাহী সকলের চোখে পড়বে, আর একটা গোটা সমাজ ও ভাষা রক্ষা পাবে সমাজের সংস্কৃতি রক্ষা পাবে; বাস্তুতন্ত্রতা রক্ষা পাবে।